গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান

মেহের‍ুন্নেছা*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি হতদরিদ্রতম দেশ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৮ বছর পরও বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার একটি নিম্নস্তরের উন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগন্য। যে কারণে বাংলাদেশকে একটি পরিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক শক্ত অবকাঠামোয় রূপদান সম্ভব হয়নি অনেক চেষ্টার পরও। বিভিন্ন প্রায়োগিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বহুবিধ কারণে। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, বৈষম্য, শিক্ষার অভাব, প্রশাসনিক দুর্নীতিগ্রস্থতা, ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি সামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈরিতা। এসব নেতিবাচক কারণ ও আঘাতের সর্বপ্রথম শিকার হয় নারী ও শিশু। চলমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ধনী হয়ে উঠেছে আরো ধনী, গরীব আরো গরীব এবং নারী হয়ে পড়ে আরো নিঃস্ব ও একান্ডিক।

এ লেখাটির ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও দৃশ্যমান দারিদ্রের প্রধান কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঘরে বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের মূল্যায়নে বা অবমূল্যায়নের দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সমস্যা পর্যালোচনা সাপেক্ষে দরিদ্র হওয়ার উপকরণগুলো চিহ্নিতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলোকে সমাধানের মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা করা হয়েছে। গ্রহণযোগ্য কিছু সুপারিশ দেওয়া হয়েছে যেগুলো অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূরীভূত এবং দারিদ্র নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

সৃষ্টির আদি থেকে একটি সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে এবং তাদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজকের এই সভ্যতা। আর মানব সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজের কল্যাণ সাধন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সামগ্রীক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে প্রচলিত গার্হস্থ্য বলয়ের বাইরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনেই নয়, নীতিগত কারণেও। একথা সত্য যে, নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে গোটা সমাজের উন্নয়ন কল্পনা করা একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের কাঠামো থেকে একটি পা কেটে বাদ দেয়ার সামিল। এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাম্যবাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, তাই তিনি বলেছেন-

---

* গবেষক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর''

কবি নজরুলের সময়কে পিছনে ফেলে আজকে আমরা যে নতুন তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে, সেখানে এসেও এই সমাজের গ্রামীণ তথা সামগ্রীক উন্নয়নে নারীর অংশ বা অবদান কতটা তা নিরুপণের প্রয়াস পাচ্ছি।

গ্রামীণ অর্থনীতির আওতা

সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমনঃ তাদের সম্পদ, মাথাপিছু আয় ও আয়ের উৎস, জীবন যাত্রার মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস এককথায় দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনাচরণ হলো গ্রামীণ অর্থনীতির আওতাভুক্ত। গ্রামীণ সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যা হলো নারী যাদের সম্পদ শুধুমাত্র ভূমি ও শ্রমনির্ভর এবং কৃষি প্রধান উপজীবিকা। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ ভূমিহীন। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ৮৫ শতাংশ পরিবারই দরিদ্র যারা এক বেলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। বি আই ভি এস এর গ্রাম জরিপ ১৯৯৫ এর হিসাব অনুযায়ী গ্রামীণ দারিদ্রের হার ৫২ শতাংশ এবং ১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী গ্রামীণ মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৮৮৮৩ টাকা। **উৎসঃ** *(বি আাই ভি এস এর গ্রাম জরিপ)*

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি সমাজ ব্যবস্থার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারী সর্বপ্রথম গৃহের আঙ্গিনায় বীজ বপনের মাধ্যমে কৃষিকাজ আরম্ভ করে। একই সঙ্গে গৃহপালিত পশুপালন নারীর আবিস্কার, কৃষি সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ সংরক্ষণ, বীজের প্রস্তুতি, বপন ও রোপন থেকে শুরু করে ফসল ঘরে উত্তোলন পর্যন্ত সামগ্রীক কর্মপ্রক্রিয়া নারী এককভাবে সম্পাদন করেন। অথচ নারীকে দেখা হয় কেবলমাত্র অনুৎপাদনশীল ভোগকারী হিসাবে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের নারীরাই তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি বাগান থেকে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ৯০-১০০ শতাংশ মিটিয়েও পরিবারের অতিরিক্ত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫-৩০ শতাংশ অবদান রাখছে (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৯)। মারডক (Murdock) এর মানব জাতির বিবরণ সম্পর্কিত মানচিত্রে দেখা যায় ১৪২ টি Horticulture Society'র অর্ধেকেরই চাষাবাদ নারীর অধীনে ছিল, ২৭ শতাংশে নারী-পুরুষ সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতো, কেবল ২৩ শতাংশ কৃষিতে পুরুষের একক দায়িত্ব ছিল। (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৯)

যুগে যুগে কৃষি ভিত্তিক কর্মকান্ডে নারীর এই বিশাল অংশ গ্রহণ সমগ্র জিডিপিতে একটি বিরাট ভূমিকা রাখছে, যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতা মাত্র ৪৭ শতাংশ ধরা হয়। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান (Invisible Contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় যা মরিমাপ করা হয় না (রহমান, ১৯৯৮)। এশিয়া মহাদেশে শুধুমাত্র চাল উৎপাদনে ৫০-৯০ শতাংশ নারী শ্রম দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর ৭৩.৩ শতাংশ কৃষিতে সরাসরি সম্পৃক্ত।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক অবদান

বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অন্যান্যরা নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে তিন ধরণের উৎপাদনশীলতার কথা বলেছেনঃ (*Blan, 1978 cited in Empowerment, 1997, vol:4*)

১। Producing goods and services at home for sale or exchange elsewhere;

২। Producing goods or services for self consumption within the household; and

৩। Working for wages outside the household.

বর্হিজগতে বা বাজার অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের কথা বাদ দিলে একজন গ্রামীণ নারী প্রতিদিন যে গার্হস্থ্য কর্ম সম্পাদন করেন যার কোনো বাজার মূল্য নাই তার একটি ছক নিম্নে দেয়া হলোঃ

সময়	কাজকর্ম
ভোরবেলা	শয্যাত্যাগ, হাত-মুখ ধোয়া, ধর্মীয় উপাসনা, হাঁস-মুরগী ছাড়া ও খাবার দেয়া, গরু-ছাগল বের করে গোয়াল ও উঠোন ঝাড় দেয়া, গরুকে খাবার দেয়া, বাসী বাসন-কোসন মাজা, নাস্তা তৈরী, পরিবারের সদস্যদের নাস্তা খাওয়ানো, ছোট সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো, পানি আনা, ঘর-দোর পরস্কার করা, গরু-ছাগলকে মাঠে ঘাস খেতে দেয়া, দুধ দোয়ানো, লাকড়ি সংগ্রহ করা ইত্যাদি ।
সকাল	ধান সেদ্ধ ও শুকানো, ধানভানা, মসলা পেষা, চাল ঝাড়া, ইত্যাদি ।
দুপুর	খাদ্য সংগ্রহ ও রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ছেলে-মেয়েদের গোসল করানো ও নিজে করা, স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো ও নিজে খাওয়া, থালা-বাসন ও হাড়ি-পাতিল মাজা ।
বিকাল/সন্ধ্যা	প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করা ও কাঁথা সেলাই করা, জাল বোনা, গরু-ছাগল আনা ও গোয়ালে ঢোকানো, হাঁস-মুরগী ঘরে আনা, রাতের খাবার তৈরী ও খাওয়ানো ।
রাত	বিছানা করা, সন্তানদের শোয়ানো, ঘরদোর বন্ধ করে শুতে যাওয়া, সারা রাতের বিভিন্ন সময়ে শিশুর পরিচর্যা করা ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো, স্বামীর পরিচর্যা করা, বৃদ্ধের পরিচর্যা করা ইত্যাদি ।

উৎসঃ বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরঃ ১৯৯৪ ।

যদিও একজন গ্রামীণ নারীর উদয়াস্ত এই শ্রম পারিশ্রমিকবিহীন তবুও বিষয়টি যে একটি অর্থনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা তর্কাতীত বিষয় । গৃহস্থালী এসব কাজের মূল্যায়ন ও তাকে জাতীয় আয়ের হিসাবের অন্তভুক্ত করার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত হলেও বা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো বিশ্ব সংস্থাসমূহের দ্বারা উৎসাহিত হলেও আমাদের দেশে এর মৌখিক স্বীকৃতটুকুও পর্যন্ত নাই ।

আই এল ও'র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নারীর মোট গৃহস্থালী শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে । আত্মপোষণশীল খাতে ব্যয়িত মোট বার্ষিক সময় ৬৯০০০

মিলিয়ন ঘন্টা, পুরুষের ব্যায়িত সময় ২৫০০০ মিলিয়ন ঘন্টা, নারী কর্তৃক ব্যায়িত সময় ৪৪০০০ মিলিয়ন ঘন্টা যা পুরুষের ব্যয়িত সময়ের প্রায় দ্বিগুণ।

তৈরী পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণ

শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামমুখী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নারীরা অধিকসংখ্যায় নিয়োজিত হচ্ছে বিশেষতঃ চা শিল্প, তাঁত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ-যেমনঃ চিংড়ি শিল্পে নারীরা অধিকহারে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া ডেইরী ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্মগুলোর ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে যার প্রায় ৯০ শতাংশই গ্রামীণ নারীদের হস্তক্ষেপে।

তৈরী পোশাক শিল্পের ৮০ শতাংশ শ্রমিক হচ্ছে নারী। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে যার ৭৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে গ্রামীণ নারী শ্রমের ভিত্তিতে। সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত মোট ১২ ঘন্টা পরিশ্রম করে এরা মাসিক ৮০০/৯০০ টাকা অর্জন করে। এক্ষেত্রে যদিও পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য রয়েছে। ১২ ঘন্টা শ্রমের মূল্য হিসাবে এই সামান্য অর্থ প্রাপ্তি একটি অমানবিক সামান্তবাদী শোষণ বৈ আর কিছুই নয়। সরকার নির্ধারিত মজুরী আইন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী মালিক মানছেন না। ফলে নারীর সঠিক শ্রমমূল্য জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত হয় না। যদিও গ্রাম থেকে হাজার হাজার নারী ছুটে আসছে পোশাক শিল্পের শ্রমিক হিসাবে গ্রামীণ দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে।

গ্রামীণ উন্নয়ন বনাম সামগ্রীক উন্নয়ন

৬৮ হাজার গ্রাম সন্নিবেশিত বাংলাদেশের যেখানে গ্রামীণ উন্নয়ন কল্পনাতীত। স্বাধীনত্তোর বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জগুলোতে তেমন কোনো কলকাখানা গড়ে উঠেনি। শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে একটি দেশের উন্নয় আশা করা যায় না। এছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। সহজশর্তে কৃষি ঋণের দুস্প্রাপ্যতা, সার ও সেচের অব্যবস্থাপনা, ভূমিহীন মজুরীভিত্তিক কৃষক, কৃষিপণ্য বিপননের সমস্যা, কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির অভাব, বেপারী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরত্নসহ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত কৃষিখাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ অর্থনীতি। সূচক যেমন জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধির হার, শিক্ষার হার, কর্মসংস্থানের হার, আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের হারের ওপর উন্নয়ন পরিমাপ করা যায়। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬% এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৪%তে। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার যাই হোকনা কেন গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি আনুপাতিক হারে। সুতারাং গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত না করে শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রীক উন্নয়নের ওপর নির্ভর করাকে সামগ্রীক উন্নয়ন বলা যায় না। আর যেহেতু গ্রামীণ অর্ধেক জনসংখ্যা নারী যাদের শিক্ষা ও তথ্য, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সাফল্য ছাড়া সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ্রামীন দারিদ্র কি? দারিদ্র বিমোচনের কৌশল কি?

দারিদ্র শব্দটি দেশভেদে ও অঞ্চল ভেদে জটিল ও আপেক্ষিক। দারিদ্রের আসলে কোনো তাত্ত্বিক সংজ্ঞা নাই। এক কথায় দারিদ্রের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। কারণ শহর ও গ্রামীণ দারিদ্রের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দরিদ্র গ্রামীণ দারিদ্রের

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমনঃ সম্পত্তির ও জমির অসম বন্টন, ফসল উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ও সেচের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের অসম সুযোগ, কর্মসংস্থানের অভাব, স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও স্বল্প মজুরী, নিু প্রবৃদ্ধির হার ও প্রবৃদ্ধির ফলাফলের অসম বন্টন, সামাজিক সুবিধাসমূহে অসম প্রবেশাধিকার ইত্যাদি। তবে দারিদ্র পরিমাপ করা হয় মোটামুটি কয়েকটি কৃষকের ভিত্তিতে সেগুলো হলো খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর নূন্যতম সামর্থের অধিকারীরা দারিদ্রের আওতামুক্ত। দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বচ্ছলতা বা অবস্থার নিরীখে চার শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

পরিবারের অবস্থান সম্পর্কে অভিমত	জরিপকৃত পরিবারের কত শতাংশ এই দলে	
	১৯৯০ সালে	১৯৯৫ সালে
অতি দরিদ্র	২৩	১৯
দরিদ্র	৫০	৩২
মোটামুটি স্বচ্ছল	১৭	৩১
স্বচ্ছল	১০	১৯
মোট	১০০	১০০

উৎসঃ বি আই ভি এস এর গ্রাম জরিপ

বিগত সরকারগুলো গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল হিসাবে প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক নীতিমালার দ্বারা দারিদ্র বিমোচনকে অগ্রধিকার দিয়েছেন। কিন্তু প্রবৃদ্ধির হার যথেষ্ট পরমিান হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র কমছে না কারণ প্রবৃদ্ধি দারিদ্রমূখী নয়। দারিদ্র না কমার কারণসমূহ মজুরী ও আয় নিুমুখী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য উদ্ধগতি। কৃষি ঋপকরণের উচ্চমূল্য একই সঙ্গে ঋৎপাদিত কৃষিপণ্যের নিুমূল্য, নারী শিক্ষার অভাব (অশিক্ষা), কুসংস্কার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যৌতুক, নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিল্পে স্থবিরতা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সমস্যা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

কৌশল

গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কিছু কৌশল অবলম্বণ করা যেতে পারেঃ

১। নারী শিক্ষা ও তথ্যের সুযোগ
২। মাথাপিছু আয় ও মজুরী বৃদ্ধি
৩। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় নারীর কর্মসংস্থান
৪। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ স্বাস্থ্য, প্রজনন ও চিকিৎসা সেবার সুব্যবস্থা
৫। ঋণ সুবধা
৬। জেন্ডার সমতা আনয়ন
৭। পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীর অংশ গ্রহণ
৮। আর্থ-সামাজিক নীতি
৯। সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন
১০। আধুনকি চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনে নারীর বাধাসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের নারীচিত্র প্রায় একই প্রকৃতির। বিশেষতঃ বাংলাদেশের একটি নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত তন্মধ্যে নারী একটি সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী যার প্রধান সমস্যা দারিদ্র। এদেশের নারীরা দরিদ্র থেকেও দারিদ্রতম। দ্বিতীয়ঃ সমস্যা হলো কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোড়ামি ও নানা ধরণের কঠোর সামাজিক অনুশাসন। তৃতীয়তঃ নারীর বিবাহ ও বিবাহিত জীবনে নির্যাতন, যৌতুকসহ বিভিন্ন অজুহাতে স্বামী ও স্বামীর পরিবার দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। ঙে দুঃসহ বলয় থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না শুধমাত্র দারিদ্রের কারণে।

ধর্মীয় কুসংস্কার ও ফতোয়া জারীর মাধ্যমে নারীর গতিশীলতাকে রোধ করা হচ্ছে। একজন নারী পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি তথা অর্থ বা বস্তগত সম্পদের যে অংশটুকু পায় তার জীবদ্দশায় সে সেটুকু ভোগেরও সুযোগ পায়না। নারীদের শুধুমাত্র কোরান শিক্ষা ও স্বামী সন্তান ও স্বামীর পরিবার লালন-পালনের মাধ্যমে একটি জীবন অতিবাহিত করতে হবে এরুপ মূল্যবোধ শক্তিশালী করার জন্য ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনে তৈরী করে তার ওপর প্রভূত প্রতিষ্ঠা করে তাকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রাখা হয়। নারীর আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন সে নিজস্ব শিক্ষা তথ্য ও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার ওপর আরোপিত প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ভেঙ্গে বস্তগত সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং এসব সম্পদের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে তার থাকবে দৃপ্ত পদচারনা যার বাজার মূল্য বা আর্থিক মূর্ল পরিমাপযোগ্য হবে। সঠিক নির্দেশনা, শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা মজুরী নির্ধারণ, সরকারী কর্মক্ষেত্রে (নারীর সীমিত অংশগ্রহণ) নারী কোটা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক হরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নারীর আর্থ সামাজিক তথা সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব।

সুপারিশ

দারিদ্র নিরসনে গ্রামীণ অর্থনীতি তথা সামগ্রীক অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং তাদের কর্মপরিধি বিস্তৃতির জন্য আমার কতগুলো নিজস্ব সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করছিঃ

* ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষা ও তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি করে নারীকে আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী করে তুলতে হবে। নারী শিক্ষা ছাড়া নারী নারী মুক্তি কল্পনাতীত।

* নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ নারীদেরকে শুধুমাত্র শিক্ষিকা অথবা সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে দেখতে পছন্দ করতেন। সেক্ষেত্রে অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা ছিল সীমিত। যেহেতু বাজার অর্থনীতিতে নারী শ্রমের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে, তাই কৃষিসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে।

* সহজ শর্তে নারীর ঋণ সুবিধা প্রদান। দেশের অধিকাংশ এনজিওগুলোতে নারী কর্মীর সংখ্যাই বেশী যা দ্বারা গ্রামীণ অশিক্ষিত বঞ্চিত নারীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ক্ষদ্রঋণ সুবিধাদানের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র ঘুচিয়ে জিডিপিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে তোলা।

* মানব সম্পদ ও দক্ষতাঃ বিভিন্ন অবৈতনিক কারিগর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ জনসম্পদে রুপান্তরিত করতে হবে।

* সম্পদের সুষম বন্টনঃ পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির যে অংশটুকু নারীর প্রাপ্য সামাজিকভাবে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় যা বিনিয়োগের দ্বারা সে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

* প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশ গ্রহণঃ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণ, নারী কল্যাণ কর্মসূচী নারীর আইনগত ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণে সঠিক ও যথোপযুক্ত বাজেট নির্ধারণ প্রয়োজন। নারীকে উন্নয়নের মূল কর্মকান্ডের স্রোতধারায় আনায়নের পরকিল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ সাপেক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ সমাজের অর্ধেক হলো নারী যারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম। তারা জন্ম থেকে দরিদ্র হয়ে আসে না, সামাজিক বৈষম্যের বেদীতে তাদেরকে দারিদ্রের বলি হতে হয়। যদিও সাংবিধানিকভাবে আর্থ-সামাজিক অধিকার কার্যকর হয়নি। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বিভিন্ন সরকার নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী সমাজ বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে গেছে। অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, প্রশিক্ষণ, জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও নিপীড়িত নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেহেতু নারীর ক্ষমতায়ন একটি সর্বাত্নক প্রক্রিয়া এবং বার্নিং ইস্যু, সেহেতু শিক্ষা, তথ্য ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন কোনোভাবে সহজ নয়।

তথ্য নির্দেশনা

১. বি.আই.ডি.এস (১৯৯৫) গ্রাম জরিপ। ঢাকা।

২. স্টেপ টুওয়ার্ডস (১৯৯৫) উন্নয়ন পদক্ষেপ। ঢাকা।

৩. হেয়টার, টেরেসা (১৯৮৭)। বিশ্ব দারিদ্র। ঢাকা গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

৪. সিদ্দিকী, কামাল (২০০২)। বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্রঃ স্বরূপ ও সমাধান। ঢাকা-শোভা প্রকাশ।

৫. মজুমদার, প্রতিমাপাল ও বেগম শরীফা (২০০১)। বাংলাদেশের দারিদ্র বয়স্কদের জন্য বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীঃ একটি পর্যালোচনাঃ। ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

৬. রহমান, রুশিদান ইসলাম, সম্পাঃ (১৯৯৭)। দারিদ্র ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ। ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

৭. আনিসুর রহমান, মোঃ (১৯৯৭)। "দারিদ্র গণনা, দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি", রুশিদান ইসলাম রহমান কর্তৃক সম্পাদিত "দারিদ্র ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" গ্রন্থে সংকঃলিত। ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। পৃঃ ৩০-৩৮।

৮. Murshid, K.|A.S, ed (1997). Proverty alleviation strategies: the next generation; conference proceedings. Dhaka Bangladesh Institute of Development Studies.

৯. Hossain, Hameeda, ed. (2001). Human right in Bangladesh: 2000. Dhaka: Ain-O-Salish Kendra.

১০. Goetz, Anne Marie, Women development workers: implementing rural credit programmes in Bangladesh, Dhaka: University Press.

১১. আনিসুর রহমান, মোঃ (২০০৭)। 'দারিদ্র চিন্তার মানবিকীকরণ এবং দেশীয় দারিদ্র-জ্ঞানতত্ত্ব নির্মানের পথে'। আবুল বারাকাত সম্পাদিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৭'- এ প্রকাশিত। খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৯-৮০।